গৃহ

ভোরবেলা বাবা এলেন, মাথার জট এবার আরও বেড়েছে, হাতে কচি কচি চারটে সজনে ডাঁটা।

এর আগে যেবার এসেছিলেন, সেবার এনেছিলেন চারটে সবেদা। মায়ের, আমার, নীলুর আরেকটা নিজের জন্য। এবারও চারটে। বাবা তো আর জানতেন না, নীলু জেলে।

বাবার ডাক শুনেই মা আমার ঘুম ভাঙান। মাথায় কাপড় দিতে দিতে বললেন, 'দরজা খোল তো।' বলে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে বাবার চোখে চোখ রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবার মাথার ওপর দিয়ে দেখলাম আকাশে তখনও শুকতারা জ্বলজ্বল করছে।

বাবা বললেন, 'ঘুমোচ্ছিলে?'

কথার উত্তর না দিয়ে মা শুধু বললেন, 'ভেতরে এসো।'

বাবাকে বসবার ঘরে বসিয়ে মা বোধহয় বিছানা তুলতে গেলেন। আগের বার বাবার পরনে ছিল গেরুয়া, মা রাগে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। এবার ময়লা, ছেঁড়া ধুতি আর ফতুয়ায় বাবাকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা ভিখিরি।

হাতের চেটোয় সিগারেট আড়াল করে বাথরুমে যাবার সময় দেখলাম, বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে দরজা-জানলার পর্দা দেখছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আজকাল কী করছ-টরছ শুনব। স্নান সেরে এসো। নীলুকে তো দেখছি না?'

বছরের পর বছর খবর রাখেন না, আজ এত খবরে কী দরকার আপনার! মুখে বললাম, 'আপনি রেস্ট করুন, মা চা আনছে।'

বাবাকে দেখে এবার কেন জানি না আমার আনন্দ হল না। বরং অস্পষ্ট একটা বিরক্তি ক্রমশই মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। শুকনো রুগ্‌ণ চেহারা, ভিখিরির অধম জামাকাপড়, বাবা এভাবে জীবনে কী আহরণ করছেন, তিনিই জানেন!

বাথরুমের দরজায় খটখট। মায়ের গলা— 'তোর কি দেরি হবে মলু?'

বেরিয়ে দেখি মায়ের হাতে বাবারই বহু যুগ আগের পাটভাঙা ধুতি। বাবার পাশে রেখে বললেন, 'ছাইভস্ম ধুয়ে, রাজবেশ ছেড়ে এসো।

বাবার মুখে অপরাধীর হাসি। সজনে ডাঁটাগুলো তখনও হাতে ধরা, মায়ের দিকে

বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বড় উপকারী। অল্প আঁচে রেঁধো।'

'তুমি খাবে না?'

'না হলে আর চারটে এনেছি!'

'তুমি বাড়ির রান্না খাবে? তোমার জন্য আলাদা হাঁড়ি মাজতে দিয়ে এলাম।'

বাবার মুখে আবার সেই গোঁফ-দাড়ি ছাপানো অপরাধীর হাসি।

মা আজ বোধহয় চায়ের কথা ভুলে গেছেন। আমার জেলের দেরি হয়ে যাচ্ছে, শুধু তো দেখতে যাওয়া না, নীলুর জন্য কিছু কেনাকাটাও করতে হবে। এদিকে ইন্টারভিউ শুরু হবার আগেই জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দরখাস্ত না দিতে পারলে সেদিন আর দেখা হবার উপায় নেই।

রবিবার এমনিতে আমার ছুটির দিন। কিন্তু জেলের তাড়াহুড়োয় সকালটা আলস্যে কাটাবার উপায় থাকে না। খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে চানটান করে তৈরি হয়ে নিই। সপ্তাহে ওই একদিনই নীলুর সঙ্গে দেখা করা যায়, অন্য দিন নিষিদ্ধ।

এর সঙ্গে আজ আবার একটু বাড়তি তাড়াও আছে। দুপুরে ঋতু আসবে। আমাদের সঙ্গে খাবে। বেরবার আগে মুরগি কিনে দিয়ে যেতে হবে। মায়ের তা অজানা নয়।

মা বাবাকে তোয়ালে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন, তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দরজায় খুব আস্তে ঠকঠক করতেই বাবা দরজা খুলে দিলেন। বাবা ধুতি পরে চান করছিলেন, তোয়ালেটা নিতে নিতে বললেন, 'নীলুকে দেখলাম না তো!'

'সে বাবু সন্ন্যেসী হয়ে গেছে!'

'সে কী!' বাবা খুব চমকে উঠেছেন মনে হল।

'সন্ন্যাসীর ছেলে সন্ন্যাসী ছাড়া আর কী হবে?' বলে এদিকে মুখ ঘোরাতেই দেখলাম, মায়ের নাকের পাটা হঠাৎ দুবার ফুলে উঠল।

মা রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম, 'নীলুর সঙ্গে আজও দেখা হওয়া মুস্কিল হবে! ঋতুরও আসার সময় হয়ে যাচ্ছে!'

খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে মা বললেন, 'ঋতুর আজ এখানে না আসাই ভালো। তুই বরং নীলুর কাছ থেকে ঋতুদের বাড়ি চলে যাস। তোরা হোটেল থেকে কিছু খেয়ে নিস।'

'বাবার কথা ঋতু তো জানেই?'

'সে জানা আর হঠাৎ এরকম দেখা এক কথা না।'

'বাবা নিশ্চয়ই দু-তিন সপ্তাহ থাকবে—'

'যা ভালো বুঝিস কর—'

বলে মা রান্নাঘরে গেলেন।

ফর্সা ধুতি পরে বাবা বাথরুম থেকে বেরলেন। চুল-দাড়ির জটা বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। বাঁহাতে সেই ছাড়া ফতুয়াটা।

আমাকে দেখে বললেন, 'নীলু তাহলে সন্ন্যাস নিল?'

আমি হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না।

বাবা ঠায় দাঁড়িয়ে। খানিকটা উদ্বেগ, কিছুটা অন্যমনস্ক। মনে হয় নিজের সঙ্গে কিছু একটা বোঝাপড়া করছেন।

হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, 'কতদিন বাড়িছাড়া?'

'সাত বছর!'

'তখন ওর বয়েস কত?'

'সে তো আপনারই জানার কথা!'

বাবা দুয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে খুব শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, তোমার মনে শান্তি নেই, শুধু বাইরের দিকে সুখ-শান্তির আয়োজন করেছ।'

এক হাতে ফ্রাই প্যানে ওমলেট, আরেক হাতে টোস্ট নিয়ে মা সোজা টেবিলের কাছে এসে বললেন, 'প্লেটটা টেনে নে।' আমার প্লেটে টোস্ট ওমলেট দিয়ে বাবাকে বললেন, 'তুমি কি এই আমিষ টেবিলে বসবে, না চা ঘরে দিয়ে আসব?'

বাবা কথার উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে খাবার টেবিলের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

মা রান্নাঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, বাবা বললেন, 'শোনো, একটা কথা বলো দেখি। নীলু কি তবে সংসারে—'

বাবা কথা শেষ করলেন না। চুপ করে আছেন দেখে মা আবার চলে যাচ্ছিলেন, বাবা বললেন, 'নীলু কি সংসারে কোনও ব্যথা পেয়েছিল?'

মা স্পষ্ট চোখে বাবার দিকে তাকালেন, মায়ের ঠিক এরকম চোখ তুলে তাকানো আমার মনে পড়ে না। ওইভাবে চেয়ে থেকেই বললেন, 'এই মলুর সামনেই বলছি, নীলু তোমার কাছে কী পেয়েছে একটু ভেবো তো!'

বাবা কিছুক্ষণ বসে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এতক্ষণে হাতের ফতুয়াটা টেবিলের কোনায় রাখলেন। ঠক করে শব্দ হল।

মা আমার জন্য চা নিয়ে এসেছিলেন, শব্দটা তাঁরও কানে গেছে— ফতুয়ার পকেটে ওটা কি গাঁজার কলকে না? যে কদিন থাকবেন, বাড়িতেও খাবেন নাকি? মা কি আগেই এটা দেখেছিলেন, তাই ঋতুকে আসতে বারণ করছিলেন?

মা গলা তুলে বললেন, 'লক্ষ্মী! এদিকে একবার আয় তো। ফতুয়াটা নিয়ে একেবারে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়!'

বাবা ব্যস্ত হয়ে ফতুয়াটা তুলে ধরে পকেট থেকে একটা বড় রঙিন পাথর বার করে নিলেন, একবার মায়ের দিকে, একবার আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'এটা নিয়ে আমি খেলি!'

মা বললেন, 'তোমার তো এখন খেলারই বয়েস!'

'না না, মন যখন বিক্ষিপ্ত হয়, ওই পাথরটা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই, মন শান্ত হয়ে যায়। ওতে আমার ভারি মনসংযোগ হয়।' একটু থেমে বললেন, 'তোমাকেও শেখাব।'

মা হঠাৎ রেগে উঠলেন মনে হয়। গলার স্বরে ঝাঁঝ নিয়েই বললেন, 'আগে সংসার-ধর্ম শেখো, তারপর তোমার সন্ন্যাস শিখিয়ো! তোমার সকালবেলায় সেবায় কী কী লাগে বললে না তো?'

বাবা মনে হয় আঘাত পেয়েছেন। স্বরে আঘাত চাপবার চেষ্টা। বললেন, 'সকালে

আমি কিছু খাই না। চা যখন করেছ, এক কাপ দিতে পারো। এক গেলাস জলও দিও।'

মা চায়ের সরঞ্জাম আজ টেবিলে আনেননি। রান্নাঘর থেকে এক কাপ চা এনে বললেন, 'এখানেই খাবে?'

'একটা টেবিল আর কী দোষ করল?'

'দোষগুণ তুমিই জানো! সেবার তো পিঁড়িও ছোঁওনি।'

মা ফ্রিজ খুলে একটা জলের বোতল বার করে এদিক ওদিক গেলাস খুঁজলেন, না পেয়ে বোতলটা বাবার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার তো কমণ্ডলু থেকে খাওয়ার অভ্যেস— খুব ঠান্ডা কিন্তু—'

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'হিমালয়ের বরফের চেয়ে তো বেশি ঠান্ডা না।'

কথাটা আমি হালকাভাবে, নির্দোষ মজা হিসেবেই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেমন ব্যঙ্গের সুর এসে গেল! বাবা দেখলাম, হাতের পাথরে চোখ নামালেন।

আগের বার বাবা যখন এসেছিলেন, বছর নয়েক আগের কথা, আমি ম্যানেজমেন্ট কোর্সের অ্যাডমিশন টেস্টে সিলেকটেড হয়ে টাকার ধান্দায় না ধরছি এমন আত্মীয় নেই, তখন আমাদের খাবার টেবিল ছিল না, মেঝেয় পিঁড়ি পেতে বসে খেতাম, আমার মনে আছে, বাবা সেবার মায়ের পীড়াপীড়িতেও পিঁড়িতে বসতে রাজি হননি। মা কেঁদে ফেলেছিলেন। এখন বুঝি, কত সামান্য কারণে মা তখন কাঁদতেন। সারা সন্ধে মায়ের ফোঁপানো কান্না শুনতে শুনতে সেদিন বাবার ওপর আমার খুব রাগ হয়েছিল।

মা চান করে শাড়ি বদলে এসেছেন। আমি খাবার টেবিলেই ছোট আয়না বসিয়ে দাড়ি কামাচ্ছি। আমাকে দেখে বললেন, 'আ! আজ আবার এখানে বসলি কেন?'

আমি মুখ না ফিরিয়েই বললাম, 'তুমি বাথরুমে ছিলে।'

মা আমাকে কিছু না বলে বাবাকে বললেন, 'দুপুরে খাবে তো? নাকি এখনও একাহারী?'

আমি টের পাচ্ছি, বাবা আমাকে দেখছেন। মাকে বললেন, 'না! আর কোনও নিয়ম নেই।'

'আজ আমাদের মুরগি হবে। তুমি খাবে?'

বাবার উত্তর নেই। একটু পরে বললেন, 'আমার জন্যে ভাতের মধ্যে কিছু সেদ্ধটেদ্ধ করে দিও। আর সজনে ডাঁটা।'

'তবে যে বললে, নিয়মটিয়ম আর মানো না?'

বাবা খুব শান্ত স্বরে বললেন, 'প্রাণী হত্যার দায়ভাগী হতে পারব না।'

বলে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

বাবার কথাটাতেই আমার জ্বালা ধরেছিল, মনে হল যেন ব্রণয় হঠাৎ ব্লেড বসে গেছে, তার ওপর ওই দীর্ঘশ্বাস আর সহ্য করতে পারলাম না। বাবার দিকে তাকিয়েই বললাম, 'তবে তো আপনার ভাতও খাওয়া চলে না! গাছও তো প্রাণীই। সজনে ডাঁটা খাওয়ার যুক্তিটাই বা কী?'

বাবা পাথরটা হাতে নিয়ে দু-হাত জোড় করে বসেছিলেন, এবারও খুব শান্ত গলায় বললেন, 'জীবন তর্কের বিষয় নয়। তর্ক খুব বাইরের জিনিস, মলয়।'

মলু না বলে মলয়! এরকম বাবা আগেও বলতেন, আমাকে মলয়, নীলুকে নীলয়, সে আমাদের ছেলেবেলায় দেশি-বিদেশি গল্প শুনিয়ে গল্পের উপদেশ যখন বোঝাতেন, তখন। আমার কথাটা একটু রূঢ় হয়ে গেছে সন্দেহ নেই, তা কী করা যাবে, আমিও তো মানুষ। একে তো শেষরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে মাথাটা ভার হয়ে আছে, তার ওপর এত আগে উঠেও লাভ কী হল? সেই দেরিই হয়ে গেল। বাজারে যাও, মুরগি কিনে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দাও, তারপর নীলুর জন্য আজ একটা মাখন আর কেজি খানেক ছোলা-বাদাম কিনব ভেবেছি, একটা পাজামা আর এক জোড়া চপ্পল চেয়েছিল, কাল কিনে রাখতে ভুলে গেছি, আজ রবিবার দোকান-টোকান কোথায় খোলা আছে কে জানে— সব তো আমাকেই সামলাতে হবে! এদিকে দেখতে দেখতে প্রায় সাড়ে আটটা। তার মানে ঋতুরও আসার সময় হয়ে এল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে মাকে বললাম, 'আমি মুরগি এনে দিয়ে যাচ্ছি। ঋতু এলে আমার ঘরে বসিয়ো। আর কিছু কি আনতে হবে?'

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতে এক পেয়ালা দুধ। আমার সামনে ধরে বললেন, 'এক চুমুকে খেয়ে নে। কখন ফিরবি, কখন খাবি তার তো কোনও ঠিক নেই। ছোট বাঁধাকপি একটা পাস তো আনিস।'

দুধে চুমুক দিচ্ছি, বাবা বললেন, 'আজ যে বড় রান্নার ঘটা! নেমন্তন্ন নাকি?'

'নেমন্তন্ন আবার কী! একটা মেয়ে আসবে, আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছি—'

'কার মেয়ে?'

'তুমি চিনবে না।'

'তোমাদের সঙ্গে কী ধরনের সম্বন্ধ?'

মা এবার একটু হেসে বললেন, 'সম্বন্ধ হয়নি, হচ্ছে। মলুর অফিসের বন্ধু। বুঝলে?

দুধ শেষ করে বেরবার মুখে অভ্যেসবশত সিগারেট ধরাতে গিয়ে সামলে নিলাম। হাতের তালুতে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলা বাবার চোখে পড়েছে। আরেকবার বাবার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি বাজারে যাচ্ছি। ফিরে এসেই আবার বেরতে হবে। আপনি বরং পিছনের বাগানে ঘুরে বেড়ান, আপনার ভালো লাগতে পারে।'

বাবা চেয়ারে বসে থেকেই বললেন, 'আমি ভাবছি, তোমাকে এত চঞ্চল দেখাচ্ছে কেন!'

'চাঞ্চল্যের কারণ আছে বলেই দেখাচ্ছে'।

'না না, সে কথা বলছি না। তুমি বড় অশান্তিতে আছো।'

ভাবলাম কথা না বাড়িয়ে চলে যাই, সত্যিই দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু হঠাৎই কী রকম জেদ ধরে গেল, বললাম, 'অশান্তির কারণ থাকলেই অশান্তি থাকবে। পাগল বা সাধু-সন্ন্যাসী হলে আলাদা কথা।'

'তুমি বোধহয় আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না। একটা কথা বলো তো, আজ যার আসার কথা তার সঙ্গে কি তোমার বিবাহ হবার সম্ভাবনা আছে?'

মা বোধহয় সবই শুনছিলেন, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বাবাকে বললেন, 'তুমি ওকে অমন জেরা করছ কেন? শুনছ ওর খুব দরকারি কাজ আছে, দেরি হয়ে গেছে—'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুই বরং আগে ওখানে যা। ফেরার সময় মুরগি নিয়ে আসিস। পাওয়া যাবে না?'

তাছাড়া আর বোধহয় উপায়ও নেই। বাজার করে ফিরে এসে নীলুর কেনাকাটা সেরে আলিপুর যাবার আর সময়ও থাকবে না। বাদ দেওয়াও আর যায় না। গত রবিবার যাওয়া হয়নি, ও খুব আশা করে থাকবে।

বাবা দাড়ির জটে হাত বোলাচ্ছেন। জট ছাড়াচ্ছেন না, হাত দিয়ে জটগুলো যেন অনুভব করছেন। আমি চলে যাচ্ছি দেখেও বললেন, 'মলুর জীবনে অনেক জট পড়েছে। সেসব না ছাড়িয়ে অন্যের জীবনে এখনই ওর জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।'

ঘরে বসে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে নীলুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন লিখতে লিখতে মায়ের গলা শুনলাম, ঝাঁঝ চাপতে পারেননি, 'বত্রিশ বছর বয়েস হল, ওকেও কি সন্ন্যাসী বানাতে চাও নাকি?'

বাবার গলা এবারে বেশ মৃদু। বললেন, 'অনুপযুক্ত হাতে সংসার করতে গেলে সংসার নরক হয়ে ওঠে।'

বাবার কথায় মা একেবারে জ্বলে উঠলেন, বোধহয় রান্নাঘর থেকে চ্যাঁচাচ্ছেন— 'সারা জীবন সন্ন্যেসীগিরি করে কাটালে, সংসারের কতটুকু বোঝ? ইচ্ছে হল আর বেরিয়ে পড়লে। মলু কত দিকে কত লড়াই করে আজ দাঁড়িয়েছে। ওর জন্যই যা হোক একটু সুখের মুখ দেখছি। কথায় কথায় ওকে অপমান করলে সইবে কেন!'

রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আ! মা! তোমরা কী শুরু করলে? ঋতু আজ না এলেই ভালো হয়!'

মা আবার বেরিয়ে এসে বাবার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি দু-দিনের জন্যে এসেছ, সংসারের সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার তোমার দরকার কী? যাও না, দু-দণ্ড বাগানে গিয়ে বসো না।'

বাবা এমন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন যে, ওরকম উত্তেজনাময় পরিবেশেও আমার বুকের মধ্যে একবার ধ্বক করে উঠল।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই ঋতুকে ফোন করলাম।

'ঋতু, শোনো, আয়াম ফিলিং সো ব্যাড—'

'কী ব্যাপার?'

'না, মানে, বলতে খুবই খারাপ লাগছে—'

'দেরি করছো কেন, বলো, বলে ফেলো, আমি কিন্তু টেন্স হয়ে যাচ্ছি—'

'মানে আমার এক আত্মীয় মারা গেছেন। আজই সকালে, এইমাত্র খবর পেলাম—'

'সো স্যাড—'

'নেমন্তন্নটা কিন্তু মুলতুবি রইল। সামনের রবিবারের পরের রবিবার। না না, আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।'

নীলুকে বাবার কথা বলব বলব করেও শেষ পর্যন্ত বললাম না। কত বছর জেলে রয়েছে, আরও কত বছর থাকতে হবে, বাবার কথা ওকে জানিয়ে লাভ কী? আর বলবই বা কী?

দু পরত তারের জালের আড়ালে গোঁফ-দাড়িময় ওর মুখটা দেখে আজ হঠাৎ মনে হল, মা খুব মিথ্যে বলেননি, সন্ন্যাসীই তো, নীলুকে ক্রমশ তরুণ সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে!

বললাম, 'আজ আর চপ্পল কেনার সময় পেলাম না। পাজামা জমা দিয়ে যাচ্ছি। তোর মাপটা মনে ছিল না, ৪০ নম্বর নিয়েছি, পরে দেখিস তো।'

'পাজামা একটু ছোট হলে এমন কী আর, বড় হলে গুটিয়ে নিলেই হবে।' তারপর লাজুক হেসে বলল, 'দুয়েক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে যেও।'

'তোর কেসের কতদূর কী হল? কোর্টে নিয়ে যায়?'

'প্রায় সব কোর্টেই কেস দিয়েছে। প্রতি সপ্তাহেই কোথাও না কোথাও যাচ্ছি। বিনা পয়সায় দেশ ভ্রমণ আর কী!'

নীলু অনায়াসে এসব কথা বলে যায়। আমিও সহজ থাকার ভান করি। সেই ভাবেই প্রশ্ন করলাম, 'তোরা শুনেছিলাম দেশ বদলে দিবি। তা দেশ তো যেখানে ছিল সেখানেই আছে। মাঝখান থেকে তোরা সরকারের অতিথি হয়ে গেলি। লাভ কী হল?'

নীলু এবারও হেসে বলল, 'এসব কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই। দাদা, তুমি বিয়ে করছ কবে?'

আমি সাধারণত এখানে এসে নীলুর সামনে সিগারেট খাই না, আজ একটা ধরিয়ে ফেললাম।

'তুমি বিয়ের কথায় চুপ মেরে গেলে যে?' হাসলে নীলুকে ভারি সুন্দর দেখায়।

আমিও হেসে বললাম, 'তুই শ্বশুরবাড়িতে, আমিও শ্বশুরবাড়িতে, মা কাকে নিয়ে থাকবে?'

'তুমি কি ঘরজামাই হচ্ছ নাকি?'

'সে তো তোরই একচেটিয়া।'

বলে আমি অকারণে পাশের গোয়েন্দা অফিসারের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকও মৃদু হাসলেন, বললেন, 'নীলয়বাবুর মতো জ্ঞানী, ওরকম চার্মিং ইয়ংম্যান আমার ২৬ বছরের চাকরিজীবনে আমি আর দেখিনি। মাঝে মাঝে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে ভাবি—'

নীলু জালের ঝাপসা আড়াল থেকে ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বলল, 'থাক থাক গোয়েন্দামশাই, আমার চরিতকথা আর নাই বা শোনালেন!'

'নীলু, বাবার কথা মনে পড়ে?'

'তুমি কোনও খবর পাও না?'

'তোর কীরকম মনে আছে শুনি?'

'সেই যে একবার গেরুয়া-টেরুয়া পরে এসেছিল। রোজ রাত থাকতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিত। চলে যাবার সময় মা গেরুয়া ফেলে দিয়েছিল। আমি অবশ্য বাবাকে খুব ভালো করে জানি না।' একটু হেসে বলল, 'আজকাল বসে বসে ডায়রি

লিখি, সময় কাটানো আর কী, বাবার কথা একদিন ভাবছিলাম। বাবা কি আমার কথা জানে?'

'বাবা জানে তুই সন্ন্যাসী হয়ে গেছিস।' শুনে নীলু হো-হো করে হেসে উঠল।

মা বোধহয় ঋতুর আশায় রয়েছেন। মুরগির অপেক্ষা করছেন। জেল থেকে বেরিয়ে আমার সমস্ত মন যেন এলিয়ে পড়ল। কী রকম মনে হল আমার আর কোথাও যাবার নেই, আমার পথ শেষ হয়ে এসেছে, এবার বসে পড়লেই হয়। অদ্ভুত একটা ক্লান্তি না বিষাদ না বিরক্তি না বৈরাগ্য— কে জানে কী আমাকে পেয়ে বসেছে।

একটা খালি ট্যাক্সি দেখে উঠে পড়লাম। পার্ক স্ট্রিটের ঠান্ডা বারে ঢুকে বিয়ার নিয়ে বসে বসে সময় কাটাতে লাগলাম, যেন সময় কাটানোই এখন আমার সবচেয়ে বড় কাজ।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেই বাবার ভজন কানে এল। ভরাট, সুরেলা গলা। হিন্দি উচ্চারণও পরিষ্কার।

গান আসছে বাগানের দিক থেকে। এগোতেই চোখে পড়ল বাবা চোখ বুজে দুলে দুলে গাইছেন। মা পাশে বসে আছেন। ঠিক একটা মূর্তি। জ্যোৎস্নায় আমগাছের বউল চকচক করছে।

'আপনাকে চা দিই দাদাবাবু?' পিছনে লক্ষ্মী এসে দাঁড়িয়েছে।

বললাম, 'থাক, এখন আর চা খাব না।'

বাবার চোখ খুলে গেল। ভজন সমে এসে পৌঁছেছে, আমার দিকে চেয়ে থেকেই শেষ করলেন।

গান শেষ হতেই মা মুখ তুলে আমাকে দেখলেন। যেন ঘোর থেকে উঠে এলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে আসতে আসতে বললেন, 'ভাবাতেও পারিস বটে! গেলি তো গেলিই। সারাদিন একটা খবর পর্যন্ত নেই। ঋতুও এল না। খেলি কোথায়? ওর ওখানেই গিয়েছিলি বুঝি?'

কিছু না বলে আমি হাসলাম।

বাবা বললেন, 'অত ব্যস্ত হও কেন? সংসার তো মায়ের আঁচল নয়!'

আমি বললাম, 'আপনি এবার কতদিন থাকবেন?'

বলতে চেয়েছিলাম, এবার কিছুদিন থেকে যেতে পারেন না?

প্রথম প্রকাশ : শারদীয় যুগান্তর, ১৯৮৪